অভিমত

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও নকল প্রবণতা

সাইফুজ্জামান

সমাজ সংসারে নকলের ছড়াছড়ি। ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় নকল হরদম হচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কারের সংখ্যা দেখে আমরা শঙ্কিত। জোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে পরীক্ষা শুরু হলেও দেদার নকল চলেছে কোথাও কোথাও। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজের ধস সবখানেই। এখন সমাজ সংসার দুষ্ট ক্ষতে আক্রান্ত। বাঙালির উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী। কম্পিউটারে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে আমাদের ছেলেরা। আবার সুনাম আছে অবিকল কিছু করার— জিনিসপত্র দেখলেই কতো নাম চলে আসে জিঞ্জিরা, গুলিস্তান, মতিঝিল মেড। পণ্যে ভেজাল, অবিকল তৈরি করে বাজারজাত করার বুদ্ধি বাঙালি ছাড়া কার আছে?

এবার ১৬ মে থেকে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল, ২. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সতর্ক ছিলেন, ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা আন্তরিকভাবে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষায় নকল হওয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে : ১. প্রাথমিক পর্যায়ে ঠিকমতো শিক্ষার্থীদের কাছে বই না পৌঁছানোর কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। বইয়ের স্তূপের মাঝে শিশু বেড়ে ওঠে। ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান,- অংকের বিবিধ ভারে অবনত শিশুশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এক ধরনের যন্ত্রে পরিণত হয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা শিশুদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি ভীতি সঞ্চার করে। তারা অন্যমনস্ক হয়। বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নোট, সিলেবাস ও কোচিঙের ধাক্কা সামলাতে তারা হিমশিম খায়। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে অভিভাবকমহলের উৎকণ্ঠা আর ছুটোছুটি চলে। প্রথম শ্রেণীতে স্কুলে ভর্তির প্রতিযোগিতা, কখনো কখনো তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা, পরবর্তী সময়ে সফলতার জন্য শিশু-কিশোরকে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া। শিক্ষকরা স্কুলে পড়ানোর চেয়ে কোচিং করতে অধিক পছন্দ করেন। কোচিং-স্কুল দুয়ের মাঝে লেখাপড়ার চাপ ও সামাজিক নানা কারণে হতাশায় ভুগে মোটামুটি পার পাওয়ার জন্য শিশু-কিশোররা নকলমুখী হয়। প্রথাগত জীবনছুট একদল ছেলেমেয়ে লেখাপড়া থেকে দূরে গিয়ে নকল করে। পরবর্তী সময়ে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে না পারলে ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে না এ দুর্ভাবনাও থাকে। ক্যারিয়ারের প্রথম পর্যায়ে একটা ভালো ফল না থাকলে পরে পস্তাতে হয়। অভিভাবকরাও মাঠে নেমে পড়েন। স্কুল কর্তৃপক্ষও চায় সরকারি অনুদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা নকলের পৃষ্ঠপোষকতা পায়। সব স্কুলের ক্ষেত্রে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি হলেও ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক মানসিক ও শিক্ষাগত স্তর উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা পর্যাপ্ত পরিমাণ নিশ্চিত হয়নি।

সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা না দেওয়ার পেছনে দেশটির আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়। বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারণী, দক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকদের দায়িত্ববোধের অভাব শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও হতাশার ক্ষত তৈরি করছে। নকল প্রবণতাও বাড়ছে। যেনতেনভাবে পাস করে চিকিৎসা, প্রকৌশল কিংবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়তে পারলেই কেল্লা ফতে- এমন এক মানসিকতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বিষয়ের তুলনায় শিক্ষকের অভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক নেই তবু একটি বিভাগ খুলে দিলেই ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এদেশে কর্মশিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক ও লাইব্রেরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কম অথচ ক্লাসের সংখ্যা বেশি— তারা কিভাবে পাঠদান করবেন এটাও প্রশ্নের উদ্রেক করে। ছাত্রছাত্রীদের নোট ও সাজেশন-নির্ভরতা বেড়েছে। পাস করা অনেক ছাত্রছাত্রী মাঝপথে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করছে। গন্তব্যে পৌঁছুতে পারছে অল্প কয়েকজন।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকে শিক্ষার মান একটা পর্যায়ে ছিল। অবস্থানটা ভালো। পড়ুয়া ছাত্রের সংখ্যাও বেশি ছিল। লাইব্রেরি ও বই ঘেঁটে ছেলেমেয়েরা পড়া তৈরি করতো। ভালো ও মাঝারি ধরনের ছাত্ররা পরবর্তী সময়ে ভালো ফলাফল করে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাস ছাত্রদের নকলমুখী করে। হত্যা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার, ছাত্রাবাস দখলসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তারা জড়িয়ে পড়ে। এ সময় আধুনিক প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের কল্যাণে বিপুল পড়ার সুযোগ ঘটলেও তারা গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। ফটোকপি, তৈরি নোট ও প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহের মাধ্যমে লেখাপড়া চলে। যারা পড়তে চায় তাদের সুযোগ বেড়েছে বটে, তবে লাইব্রেরি ব্যবহার, পড়ার পর নোট তৈরি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সেশনজট না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেশনজট আছে। রাজনৈতিক কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নীত করতে পারলে ছাত্রদের নকল করার মানসিকতা দূর হবে। শিক্ষকদের নৈতিক স্খলন হওয়ার পেছনে বড়ো কারণ সম্ভবত আর্থিক অনটন ও রাজনৈতিক চাপ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করতে পারে না। তারা টিউশনি করে সংসার চালায়। কখনো কখনো অধিক আয়ের আশায় শিক্ষকরা ক্লাসে মনোযোগী হন না। নকল করতে উৎসাহ জোগান। সমাজের রাজনৈতিক চাপের কারণে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পুত্র কন্যাদের নকল করতে তারা সাহায্য করেন। স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের কর্তাব্যক্তিদের দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে তাদের নীতি ও নৈতিকতা হার মানে। মফস্বল শহরে পুলিশের সংখ্যা কম। নকল সরবরাহকারীরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। শিক্ষকরাও নকলে সাহায্য করেন কিংবা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন না। যোগ্য শিক্ষকরা যোগ্য ছাত্র তৈরি করেন। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয় এমন একটি স্কুল, কলেজ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক কিভাবে নিয়োগ করবে? মেধাবীরা ক্যারিয়ারিস্ট হয়ে অন্যত্র চলে যান আর্থিক ও বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির আশায়।

সচেতন অভিভাবক মহল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য ও ছাত্রছাত্রীদের কমিটমেন্ট শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও প্রভাবশালী মহলের আধিপত্যের অবসান হওয়া জরুরি। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করে তুলতে হবে সবাইকে। বিদেশে ও স্বদেশে আমাদের সন্তানরাই মেধার স্বাক্ষর রাখছে। শিক্ষার্থীদের যথাযথ গাইড করতে পারলে দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হবে।

সাইফুজ্জামান : কলাম লেখক, প্রাবন্ধিক, জাদুঘর কর্মকর্তা।

MAY 29 2007